পরিশিষ্ট-৯

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে আলোচনা

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ দেশে এক-কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা (Unitary Form of Government) চালু রয়েছে। বিভিন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা বা প্রদেশ গঠনের বিপক্ষেও জোরালো মতামত রয়েছে। প্রদেশ গঠনের বিপক্ষে যাদের অবস্থান তারা মনে করেন যে, প্রদেশ গঠিত হলে বিভিন্ন প্রদেশে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান ঘটতে পারে এবং তার ফলে দেশের অখন্ডতা বিনষ্ট হতে পারে। দ্বিতায়ত, এত ছোট্ট আয়তনের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সরকারের (Federal form of Government) প্রয়োজন নেই, এখানে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা (Unitary Form of Government) থাকাই উত্তম। তাদের আরেকটি আশংকা প্রদেশ গঠিত হলে দুই স্তরের সরকার পরিচালনার জন্য অনেক অর্থ ও লোকবলের প্রয়োজন হবে, যা এ মুহূর্তে সরকার বা জনগণের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রাদেশিক পর্যায়ে পরিণত রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকার কারণে প্রদেশগুলোতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর নাও হতে পারে।

তবে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন মনে করে যে, ফেডারেল সরকার বা প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা গঠনের বিপক্ষে উপরে বর্ণিত যুক্তিগুলোর কোনটিই বাস্তবভিত্তিক বা খুব যৌক্তিক নয়। প্রথমত, প্রস্তাবিত চারটি প্রদেশের অধিকাংশ মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে এতটাই মিল যে, এর কোনো একটি প্রদেশে আঞ্চলিক অখন্ডতা বিনষ্ট করার মত যথেষ্ট কার্যকারন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত চারটি প্রদেশের কোনো একটির বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবোপযোগিতা (Viability) এবং কার্যকারিতা (Effectiveness) নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের আয়তন ছোট হলেও জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ১৭ কোটি মানুষের একটি দেশের শাসনকার্য শুধুমাত্র একটি কেন্দ্র থেকে কীভাবে পরিচালনা করা সম্ভব সে প্রশ্ন অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া, পৃথিবীতে বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট দেশেও ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা (Federal form of Government) চালু রয়েছে, যেমন- নেপাল, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আয়তন ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। সে তুলনায় বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ডের আয়তন যথাক্রমে ৩০,৬৮৮ বর্গ কিলোমিটার এবং ৪১, ২৮৫ বর্গ কিলোমিটার মাত্র।

পরিচালনার জন্য লোকবল বা অর্থ-সম্পদ যোগান দেয়ার সামর্থ্যের বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রদেশ গঠিত হলে প্রদেশগুলোর জন্য নতুন কোনো লোকবল নিয়োগের প্রয়োজন হবে না। কারন বর্তমানে বাংলাদেশের বেশীরভাগ মন্ত্রণালয় এবং সরকারি বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অধীনস্ত দপ্তরসমূহে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী লোকবল রয়েছে। এসব অতিরিক্ত লোকবল প্রাদেশিক সরকারসমূহের বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ দেয়া যাবে। তাছাড়া, প্রদেশ গঠিত হলে সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে বিধায় কেন্দ্রীয় সরকারের কম করে হলেও শতকরা ৬৫ ভাগ লোকবল প্রদেশগুলোতে হস্তান্তরিত হবে। মাঠ প্রশাসনের লোকবল এখন যেভাবে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাতে যেসব দপ্তরে কর্মরত আছে, তারা সেখানেই অবস্থান করবে এবং অধিকাংশ দপ্তরই প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ন্যস্ত থাকবে। মাঠ প্রশাসনের

দু'একটি দপ্তর হয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করবে। সুতরাং মাঠ পর্যায়ে কোনো অফিস-আদালত নতুন করে স্থাপন করতে হবে না। প্রাদেশিক সরকারের রাজধানীতে প্রয়োজনীয় কিছু নতুন অবকাঠামো তৈরি করতে হবে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে করা যেতে পারে। অন্যদিকে, স্বাভাবিক নিয়মে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমানে যে বাজেট বা অর্থ সম্পদ রয়েছে সেটাও প্রাদেশিক সরকার পরিচালনার জন্য যৌক্তিকভাবে বন্টন করা হবে বিধায় অর্থ সম্পদের অভাবে প্রদেশ গঠন করা যাবে না- এ যুক্তিও ধোপে টিকে না।

বাংলাদেশে এককেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে এর ফলে দেশে স্বৈরাচারের জন্ম হয় বা হয়েছে, যা এ দেশের সবাই প্রত্যক্ষ করেছে। এককেন্দ্রিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় যত সংস্কারই করা হোক না কেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরাচার হওয়ার প্রবনতা রুদ্ধ করা কঠিন হবে। সে কারণে এ দেশে নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রকে এক ব্যক্তি তথা একজন প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত না রেখে যদি রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভাজিত করা যায় ও সরকারের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দেশের চারটি প্রদেশের মধ্যে বিভাজন করা যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্দোলনের রাজনীতি এবং সর্বোপরি স্বৈরশাসনের প্রবনতা বেশ হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা বা প্রাদেশিক সরকার চালু হলে সবচেয়ে বড় অর্জন হবে সরকারি কাজ ও জনসেবার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ। দীর্ঘদিন যাবত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালী করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু ওইসব সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি এবং বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। এর মূল কারন এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিক আইনের অধীনে সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা ও কর্মকান্ড স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে স্থানান্তরিত হয় না। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট তার অর্পিত (delegated) ক্ষমতা ও কাজ নিয়ে যে কোনো সময় নয়ছয় করতে পারে বা তাদের জনসেবামূলক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে এককেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের ইউনিট হিসেবেই কাজ করে। অর্থাৎ তারা নামেই স্থানীয় সরকার, বাস্তবে সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং চলে। সুতরাং, সরকারি সেবা এবং ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যেও দেশে ফেডারেল বা প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, এ কমিশন বাংলাদেশে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা তথা চারটি প্রদেশ স্থাপনের সুপারিশ করছে। পুরাতন চারটি বিভাগ, যথা- (১) ঢাকা, (২) চট্টগ্রাম, (৩) রাজশাহী, এবং (৪) খুলনা বিভাগ নিয়ে চারটি প্রদেশ গঠিত হবে। প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ থাকবে। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বেঞ্চ প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে স্থাপিত হবে। প্রাদেশিক পরিষদের জন্য প্রতি উপজেলাকে একটি করে নির্বাচনী এলাকা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র শাসিত একটি 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' করার যেতে পারে।

প্রাদেশিক সরকার স্থাপিত হলে যে সকল বিষয় (Subjects) কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীন থাকতে পারেঃ
(১) প্রতিরক্ষা, (২) পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, (৩) স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত নীতি, (৪) অর্থ, আয়কর ও শুল্ক, ঋণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, (৫) মুদ্রা ও কয়েন, (৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, (৭) বিদেশী বিনিয়োগ, (৮) রেলওয়ে, (৯) মহাসড়ক উন্নয়ন (Highways Development), (১০) বিমান, সমুদ্র ও নদী বন্দর, (১১) খনিজ পদার্থ, জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ, (১২) বিজ্ঞান ও আনবিক শক্তি প্রভৃতি।
প্রাদেশিক সরকার গঠিত হলে যে সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হবেঃ

(১) পুলিশ প্রশাসন, (২) স্বাস্থ্য সেবা ও প্রশাসন, (৩) শিক্ষা প্রশাসন, (৪) কৃষি, মৎস ও পশু সম্পদ, (৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, (৬) শ্রম ও জনশক্তি, (৭) সমাজ সেবা ও সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা, (৮) ভ্যাট বা বিক্রয় কর, (৯) বন ও পরিবেশ, (১০) সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ব, (১১) পর্যটন, (১২) যুব ও খেলাধূলা, (১৩) পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যান প্রভৃতি। তবে কিছু বিষয় একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার- উভয়েরই ভূমিকা থাকবে। যেমন- উচ্চ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতি ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার উপরও বর্তাবে। তেমনি ধর্ম, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়নেও উভয় সরকারেরই ভূমিকা থাকতে পারে।

পরিশিষ্ট-১০

কমিশনে সরকার মনোনীত শিক্ষার্থী প্রতিনিধি সদস্যের বক্তব্য

জুলাই বিপ্লবের শহিদদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাদের মাগফেরাত কামনা করছি। যারা আহত তাদের সুস্থতা প্রার্থনা করছি। ছাত্র জনতার রক্তে রাঙা এ জুলাই অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষার ফসল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে একটি গণতান্ত্রিক দেশ ছিল। গত অর্ধশতাব্দী ধরেই স্বার্থবাদী এবং ক্ষমতালোভী শ্রেণীর কাছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বারবার ব্যাহত হয়েছে। সামরিক স্বৈরাচার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সর্বশেষ ১৬ বছরে অভিশপ্ত ফ্যাসিবাদ ও তার অংশীদারেরা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে দিয়ে নিজেদের মতো করে জনবিরোধী রাক্ষসে পরিণত করেছে। ফ্যাসিবাদ ভোট জালিয়াতি ও পাতানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পদ্ধতিগত একনায়কতন্ত্রে প্রবর্তিত হয়েছিল। গণতন্ত্রকে হাস্যকর রূপে রূপায়িত করেছিল। একদিকে মানুষের বাক স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে; অন্যদিকে গণতন্ত্রের নাটক মঞ্চস্থ করেছে। একদিকে মানুষকে তথাকথিত চেতনার আফিমে আসক্ত করেছে; অন্যদিকে মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য ও সামাজিক সুবিচার মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। একদিকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে; অন্যদিকে উন্নয়নের মরীচিকা সৃষ্টি করছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় যে অংশীদার রাষ্ট্রের জনগণ সেই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে রক্তচোষা ফ্যাসিবাদ স্বেচ্ছাচারিতার চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। লাল জুলাইয়ের এই বিপ্লবে মানুষ প্রমাণ করেছে যে, মানুষকে জোর করে বশ করা যায় না। মানুষকে গোলামির শেকলে আবদ্ধ করতে পারে না। মানবিক মর্যাদা বোধের জন্য লড়াই করা প্রত্যেকটি যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

প্রফেসর ড. আলী রিয়াজ তার একটি প্রবন্ধে লেভিটস্কি এবং জিবল্যাটর মডেল উপস্থাপন করেছেন। তারা যুক্তি দেন যে, গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ (Democratic Backsliding) তিনটি ধাপে ঘটে। এ ধাপগুলো হলোঃ (১) রেফারিদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা। (২) সরকারের বিরোধীদের লক্ষ্যবস্তু করা। (৩) খেলার নিয়ম পরিবর্তন করা। প্রথম ধাপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রেফারি বলতে বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কর এবং নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলোকে বুঝায়। রেফারিদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতায় টিকে থাকা। রেফারিগুলোকে নিজেদের কাজ করার মাধ্যম হলো ঘুষ ও ব্লাকমেইল করা, অনুগতদের দিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতিস্থাপন, বিচারকদের অভিশংসন, দলীয় ব্যক্তিদের আদালতে নিয়োগ দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। এর প্রতিটি বাংলাদেশে ঘটেছে।

আমলাতন্ত্র একটি অরাজনৈতিক ধারণা। ম্যাক্স ওয়েবেরিয়ান মডেল অনুয়ায়ী আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিরপেক্ষতা (Impersonality), অর্থাৎ সবধরণের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কাজ করা। একজন আমলার পক্ষে অরাজনৈতিক থাকার ধারণাটি অন্ততঃ যে দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খুবই দুর্বল সেই দেশগুলোর ক্ষেত্রে অবাস্তব। কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দূরদর্শী নেতৃত্ব অবাস্তবকে বাস্তব করতে পারে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ আজকের মালয়শিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর।

এ মুহূর্তে বাংলাদেশে যদি দুর্নীতির পরিমাণ শূন্য শতাংশও হয়, তথাপি সেবা প্রদান ও নীতি নির্ধারণে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের কার্যকারিতার হার খুবই হতাশাজনক হবে। দুর্নীতির বাইরেও একেবারে স্থানীয় পর্যায় থেকে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের প্রধান সমস্যাগুলো হলো বিকেন্দ্রীকরণের অভাব, প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সরবরাহ (Logistic) নেই, সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাব, পেশাদারিত্বের অভাব,

পেশাগত প্রেরণার (Professional motivation) অভাব, পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব, গতিশীলতার অভাব, র্কাক্রমের পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী (Innovative) সিদ্ধান্তের অভাব, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব।

আরও একটি বড় সমস্যা হলো আন্তঃক্যাডার বৈষম্য। বিগত সময়ে স্বার্থ হাসিলের জন্য নির্দিষ্ট একটি ক্যাডারকে মাত্রাতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করার মাধ্যমে বিরাট একটি অংশের কর্ম-মনোবল ভেঙে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়ার মাধ্যমে প্রশাসনকে জনবান্ধব হওয়ার পথকে রুদ্ধ করেছে। গত দেড়যুগে এ প্রচেষ্টাটি আরো প্রকট হয়েছিল। প্রশাসন জনবান্ধব হওয়ার পরিবর্তে জন-রাক্ষসে পরিণত হয়েছিল। ভোট জালিয়াতি থেকে শুরু করে মানুষ খুন সব করানো হয়েছে এ প্রশাসনের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে গেছে, মানুষ ভুলে গেছে সে নাগরিক। রাষ্ট্র ও নাগরিকের স্বাভাবিক সম্পর্ককে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে এক অরাজকতাপূর্ণ ভয়ানক পরিস্থিতির প্রবর্তন ঘটান হয়েছিল। এ সংস্কার প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

কর্মচারী-কর্মকর্তাদের অধিকাংশই বিগত আমলে দলীয় নিয়োগ ছিল। আবার অনেকে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে স্বৈরাচারের সঙ্গ দিয়েছিল। বিগত বছরগুলোতে যেসকল সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ ভোট জালিয়াতি, অর্থপাচার, দুর্নীতি এবং জুলাই-আগস্টের গণহত্যার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে প্রশাসনের পেশাদারিত্ব, ভাবমূর্তি ও একটি গণতান্ত্রিক দেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত করতে হবে। তাদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যেন ভবিষ্যতে কোনো সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা নিজের পেশাদারিত্ব ভুলে গিয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলে কাজ করতে না পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তিনটি হলো জাতি হিসেবে আমাদের মনোজাগতিক পরিবর্তন। রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি নাগরিকের মধ্যে এ মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। জুলাইয়ের প্রেক্ষাপট উপলব্ধির মাধ্যমে হাজারো আত্মত্যাগের মাহাত্মকে ধারণ করতে হবে।

এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ আবারো প্রমাণ করেছে যে রাষ্ট্রনেতা মানুষের ভাষা বোঝে না তার রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার কোনো অধিকার এবং যোগ্যতা নেই। যে বা যারা মানুষের অধিকার হরণ করে মানুষকে খড়কুটোর ন্যায় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে চায় তাদের পরিণতি অত্যন্ত অপমানজনক ও ইতিহাসে ভবিষ্যতের জন্য নিদর্শন হয়ে যায়। জুলাই-আগস্টের এই জন-বিপ্লব মানুষের বহুদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই বিপ্লব একটি প্রজন্মের বদলে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। একটি অপশক্তি শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একটি বিকলাঙ্গ প্রজন্ম তৈরিতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সেই শক্তির সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়ে “আই হেইট পলিটিক্স” বলা প্রজন্মটি ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণিত স্বৈরাচারের দম্ভকে চুরমার করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, কালের যেকোনো প্রান্তেই তারুণ্য সবসময় ডুবন্ত জাতিকে বীরদর্পে টেনে তোলার প্রয়াসে সদা প্রস্তুত থাকে। এ বিপ্লব ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবে তাদের জন্যেও একটি সচেতন বার্তা। আমাদের ঘুণে ধরা ভঙ্গুর জাতীয়তাবাদে এ বিপ্লব নতুন এক শক্তির সঞ্চার করেছে। জাতি হিসেবে নতুন করে চিন্তা করার সুয়োগ দিয়েছে। বিভক্তির খেলায় মেতে উঠলে জাতিকে কীভাবে চরম মূল্য দিতে হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শকুনেরা কীভাবে আমাদের সার্বভৌমত্বকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করে সেই শিক্ষাটা এ বিপ্লবের অন্যতম অনুষঙ্গ। ইতিহাস আমাদেরকে বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছে। চব্বিশের এ সাফল্য আরও একটি বড় সুযোগ। এ সুযোগকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে

দেওয়া যাবে না। পরিবর্তনের ঢেউ প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকাণ্ডকে যেন প্রভাবিত করে। সংসদ থেকে চায়ের দোকান পর্যন্ত সর্বস্তরে একটি বাংলাদেশের স্বপ্নকে সামনে রাখে নতুন বোধের জন্ম দিবে। এ বোধশক্তির প্রভাবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে। তথাকথিত সোনার বাংলার চেয়ে একটি মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন সাম্য ও ইনসাফের বাংলাদেশ সকলের আত্মার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষরিত থাকবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মেহেদী হাসান
সদস্য ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন